ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 1040-1045
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.102

যাদুগোড়ার রঙ্কিনী দেবীর ইতিহাস: আদিবাসী দেবীর ব্রাহ্মণ্যবাদী নির্মাণ

রুনা শ্যামল, *গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 11.03.2025; Accepted: 22.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The famous temple of Goddess Rankini is situated on the foothill of the Tuila hill in Jadugora of Rohinibeda block in Singhbhum district of Jharkhand. The origin of this goddess of is narrated in the story titled 'Rankini Devi's Kharga' by Bibhutibhushan Bandyopadhyay. The origin of Rankini Devi of Jadugora is very amazing. Once upon a time, Rankini was a terrifying Goddess. A number of folktales about this her are still prevalent in the surrounding villages of Jadugoda. The regional kingdom of Dhalbhumgarh is connected with this Goddess. Rankini is regarded as the tutelary deity. With the expansion of the Brahmanical culture in this region, Goddess Rankini has now been transformed into 'Kali', a very popular deity of Hinduism. However, tribal people of Jharkhand and South Western Bengal consider Rankini as their own indigenous deity. For instance, Rankini is revered by the Bhumijs of this region. Moreover, the temple of Rankini is considered one of the sacred shrines of the tribal groups located in eastern India. During the time of worship of Rankini, the presence of a tribal priest or laya is necessary. The article will explore the origin of Goddess Rankini and also analyse the process of incorporation of this tribal Goddess in the fold of Brahmanical culture.

Keywords: Rankini Devi, Religion, Indigenous, Culture, Jharkhand

যাদুগোড়ার টুইলা পাহাড়ের পাদদেশস্থিত কাপড়গাদী ঘাটের রঙ্কিণী মন্দির বিষয়ক আলোচনার সূত্রপাতের আগে রঙ্কিণী দেবীর উৎপত্তির ইতিহাস বিশ্লেষণ একান্ত জরুরী। দক্ষিণ পশ্চিম বাংলা ও তৎসংলগ্ন ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে রঙ্কিণী অত্যন্ত জনপ্রিয় এক দেবীসত্তা। রঙ্কিণী দেবী মূলত হিন্দু দেবী কালীর এক রূপ হিসেবে পরিচিতি অর্জন করেছেন। হিন্দু দেবমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত হলেও রঙ্কিণী দেবীর উল্লেখ প্রথম সারির কোনও হিন্দু শাস্ত্রে নেই। এমনকি বাংলা অঞ্চলে রচিত পুরাণ ও উপপুরাণেও দেবী রঙ্কিণীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার অধিবাসীদের মধ্যে রঙ্কিণী দেবীকে কেন্দ্র করে অসংখ্য মিথ বা প্রত্নকথার প্রচলন রয়েছে। এগুলির অধিকাংশ নেহাতই কাল্পনিক। ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে রঙ্কিণী দেবীর মাহাত্ম্য বিচার্য বিষয় না হলেও এসকল প্রত্নকথাগুলি কিন্তু আদৌ গুরুত্বহীন নয়। রঙ্কিণী দেবীর প্রাচীন সত্তা ও ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু দেবীতে তাঁর রূপান্তরের প্রক্রিয়া অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি প্রত্নকথার বিশ্লেষণ যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। বাংলা সাহিত্যে রঙ্কিণী দেবীর সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটদের জন্য লেখা একমাত্র গল্পগ্রন্থ 'তালনবমী'র 'রঙ্কিণী দেবীর খড়্গ' শীর্ষক এক বিখ্যাত অলৌকিক কাহিনিতে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘাটশিলায় তাঁর জীবনের বেশকিছু কাল অতিবাহিত করেছিলেন। এসময় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে রঙ্কিণী দেবী সম্পর্কে প্রচলিত বিভিন্ন লোককথাগুলি সম্পর্কে তিনি অবগত হয়েছিলেন। লোকমুখে প্রচলিত গল্পগুলির ওপর ভিত্তি করে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রঙ্কিণী দেবীর বিষয়ে এই বিখ্যাত গল্পটি রচনায় সমর্থ হয়েছিলেন। 'রঙ্কিণী দেবীর খড়্গ' নামাঙ্কিত গল্পটিতে বর্ণিত হয়েছে যে চেরো গ্রামের এক মাইনর স্কুলে শিক্ষকতাকালে লেখক গ্রাম সংলগ্ন পাহাড়ে রঙ্কিণী দেবীর এক প্রাচীন জরাজীর্ণ মন্দিরের সন্ধান পেয়েছিলেন। তবে শত প্রচেষ্টার পরও তিনি এই দেবী সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কারণ গ্রামবাসীরা এই দেবীকে অত্যন্ত ভয়

পেতেন ও তাই রঙ্কিণীর বিষয়ে তাঁরা বার্তালাপে আগ্রহী ছিলেন না। এরপর চেরো গ্রামের অধিবাসী চন্দ্র পাণ্ডার থেকে লেখক রঙ্কিণী দেবীর বিষয়ে সবিস্তারে জানতে পেরেছিলেন।

> "মানভূম জেলায় আগে অসভ্য বুনো জাত বাস করত। তাঁদেরই দেবতা উনি। ইদানীং হিন্দুরা এসে যখন বাস করলে, উনি হিন্দুদেরও ঠাকুর হয়ে গেলেন। তখন তাঁদের মধ্যে কেউ মন্দির করে দিলে। কিন্তু রঙ্কিণী দেবী হিন্দু দেব-দেবীর মতো নয়, অসভ্য বন্য জাতির ঠাকুর- আগে ওই মন্দিরে নরবলি হ'ত- ষাট বছর আগেও রঙ্কিণী মন্দিরে নরবলি হয়েছে।"[১]

চন্দ্র পাণ্ডা লোকমুখে রঙ্কিণী দেবীর সম্পর্কে যতখানি তথ্য পেয়েছিলেন তা লেখককে জানিয়েছিলেন-

> "আমি যখন প্রথমে এদেশে আসি, সে আজ চল্লিশ বছর আগের কথা-তখন প্রাচীন লোকেদের মুখে একথা শুনেছিলাম।"[২]

লোকমুখে প্রচারিত কাহিনি বা প্রত্নকথার ওপর ভিত্তি করে রঙ্কিণী দেবীর উৎপত্তির যে বিবরণ রয়েছে, তাতে 'মানভূম জেলার অসভ্য বুনো জাত' –এসকল শব্দগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রঙ্কিণী দেবী সংক্রান্ত কাহিনীতে উল্লিখিত মানভূমের 'চেরো' নামক স্থানটি কাল্পনিক হলেও পূর্বতন মানভূম তথা অধুনা পুরুলিয়ার জনজীবনে রঙ্কিণী দেবী সর্বজনবিদিত এক দেবীসত্তা। গল্পে উল্লিখিত বুনো অসভ্য জাতি নিঃসন্দেহে বর্তমান পুরুলিয়ার আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলি। তাঁরাই এই অঞ্চলের আদিম জনসমষ্টি। এসকল আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে ভূমিজ, সাঁওতাল, হো, মুন্ডা, মাহালী, ওঁরাও, কোড়া ও বিরহড় অন্যতম। হিন্দু সংস্কৃতির সম্প্রসারণের পূর্বে পুরুলিয়ায় এক সমৃদ্ধ জৈন সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল। পুরুলিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে অবহেলায় অনাদরে পড়ে থাকা জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্তিগুলি তার প্রমাণ বহন করে। সর্বোপরি এই অঞ্চলে সরাক নামক এক জৈন ধর্মালম্বী গোষ্ঠীর বাস এখনও পর্যন্ত বিদ্যমান। কথিত আছে যে সর্বশেষ বা চব্বিশতম তীর্থঙ্কর মহাবীর একদা ধর্ম প্রচারকার্যে বজ্রভূমিতে এসেছিলেন। তবে বজ্রভূমির অভিজ্ঞতা মহাবীরের জন্য সুখকর হয়নি। তাঁর উদ্দেশ্যে বজ্রভূমির অসভ্য অধিবাসীরা কটু বাক্য প্রয়োগ, তীর নিক্ষেপণ ও কুকুর লেলিয়ে দেওয়ার মতো হীন কাজ করেছিলেন।[৩] মানভূম তথা পুরুলিয়ার প্রাচীন নাম ছিল বজ্রভূমি। অতএব এই অঞ্চলের আদিবাসী সংস্কৃতির প্রাচীনত্বের বিষয়ে তেমন কোনও সংশয় নেই। ডাল্টন ভূমিজ জনগোষ্ঠীকে মানভূমের অন্যতম আদিম অধিবাসী হিসেবে গণ্য করেছেন। যদিও এল এস ও ম্যালি মনে করেন যে ভূমিজ ও সাঁওতালরা মানভূমের আদিমতম জনসমষ্টি। তবে ভূমিজ সম্প্রদায়ের সাথে রঙ্কিণী দেবীর সবিশেষ সংযোগ পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে যাদুগোড়ার রঙ্কিণী মন্দিরের পূজারীদের মধ্যে ভূমিজ পুরোহিতরা হলেন অন্যতম। এমনকি যাদুগোড়ার এই রঙ্কিণী দেবীর সাথে পুরুলিয়ার সংযোগ রয়েছে।

যাদুগোড়ার রঙ্কিণী মন্দিরের ইতিহাস নির্ণয়ন আদৌ সহজসাধ্য নয়। কারণ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গালুডির মহুলিয়া ও বড়বিল এবং ঘাটশিলায় আরও তিনটি রঙ্কিণী মন্দিরের অবস্থান রয়েছে। যাদুগোড়ার থেকে গালুডির মন্দির দুটির দূরত্ব প্রায় ১২ কিমি। অন্যদিকে মহুলিয়া ও বড়বিলের মধ্যে দূরত্ব প্রায় ৩ কিমি। আবার যাদুগোড়া ও ঘাটশিলার রঙ্কিণী মন্দিরের মধ্যে দূরত্ব প্রায় ২৩ কিমি। মন্দিরগুলির মধ্যে যে কোনটি প্রাচীনতম তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। মহুলিয়ার মন্দিরের প্রবেশদ্বারে উৎকীর্ণ বিবরণে এটিকে রঙ্কিণী দেবীর প্রাচীন মন্দির হিসেবে দাবী করা হয়েছে। আবার ঘাটশিলা থানার একদম পাশেই অবস্থিত রঙ্কিণী মন্দিরের নির্মাণকার্যে ধলভূমগড়ের ধবল রাজপরিবারের নাম শোনা যায়। সবচেয়ে বড় সমস্যা হল যে যাদুগোড়া, মহুলিয়া, বড়বিল ও ঘাটশিলার এই চারটি রঙ্কিণী মন্দিরের একে অপরের সাথে সংযোগ রয়েছে। কথিত আছে মহুলিয়ার মন্দিরটিও ধলভূমগড়ের রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়েছিল। যদিও নরবলির বিষয়কে কেন্দ্র করে সমস্যা উদ্ভূত হওয়ায় ধবল রাজবংশের উদ্যোগে মন্দিরটি ঘাটশিলায় স্থানান্তরিত হয়। আবার যাদুগোড়ার মন্দির প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ধবল রাজাদের অবদানের কথা লোকমুখে প্রচারিত আছে। তবে কোন রাজার আমলে মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল সে বিষয়ে ইতিহাসে বিশদে কোনরূপ তথ্য নেই। এক্ষেত্রে জনপ্রিয় মতটি হল যে ধবলরাজ জগন্নাথ যাদুগোড়া, মহুলিয়া, ও ঘাটশিলার রঙ্কিণী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বর্তমানে যাদুগোড়া সংলগ্ন এলাকায় সর্বমোট যে চারটি মন্দির রয়েছে প্রতিটি মন্দিরের কাঠামো সাম্প্রতিককালে নির্মিত হয়েছে। তাই মন্দিরের গঠনগত বৈশিষ্ট্য নিরীক্ষণের মাধ্যমে প্রাচীনত্ব নির্ণয়ের বিন্দুমাত্র উপায় নেই। এমতাবস্থায় মিথ বা প্রত্নকথাগুলিতে রঙ্কিণী দেবীর যে উল্লেখ রয়েছে সেগুলির বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সমর্থ হবে। রঙ্কিণী দেবীর বন্দনায় বিবৃত হয়েছে-

> "পুরুলিয়া থেকে এলে কাপড়গাদী ঘাটে। কাপড়গাদী ঘাট থেকে গেলে ঠাকুরান পর্বতে।। ওখান থেকে এলে মা তুমি মহুলিয়াতে। রয়ে গেলে ধলভূমে ভক্তের পূজা নিতে।।"[৪]

পংক্তিটিতে উল্লিখিত ঠাকুরান পাহাড়ের অপর নাম হল রঙ্কিণী ডুংরি যা বড়বিলে অবস্থিত। রঙ্কিণী দেবীর এই মাহাত্ম্য নিঃসন্দেহে অনেক পরবর্তীকালের রচনা কিন্তু এখানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে দেবীর আগমন পুরুলিয়া থেকে প্রথমে যাদুগোড়ার কাপড়গাদী ঘাটে হয়েছিল। ডাল্টন তাঁর গ্রন্থে পুরুলিয়া থেকে দেবীর ধলভূমগড়ে আগমনের কাহিনী বিবৃত করেছেন। কথিত আছে যে ধলভূমগড়ের রাজপরিবার এক ব্রাহ্মণের প্ররোচনায় পাঞ্চেতের রঙ্কিণী মন্দির থেকে দেবীমূর্তি চুরি করে নিয়ে এসে নিজের রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৫] এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখ্য যে রঙ্কিণী দেবীর কোনরূপ মূর্তি সাধারণত প্রচলিত নেই। দেবী অপরিশীলিত প্রস্তরখণ্ডের মাধ্যমে পূজিতা হন। একমাত্র ঘাটশিলা থানার পাশে অবস্থিত রঙ্কিণী মন্দিরে দেবীর মূর্তি রয়েছে এবং তাঁকে কালীর আরেক রূপ হিসেবে গণ্য করা হয়। যদিও পুরুলিয়ার কোন অঞ্চল থেকে দেবীমূর্তি সংগৃহীত হয়েছিল তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। একটি প্রচলিত মত হল যে পুরুলিয়ার পাঞ্চেতের মন্দির নয় বরং পাড়ার মন্দির থেকে ধবল রাজারা রঙ্কিণী মূর্তিটি নিয়ে এসেছিলেন। তবে ধবল রাজপরিবার কর্তৃক রঙ্কিণী মূর্তিটি বর্তমানে কোন মন্দিরে অধিষ্ঠিত রয়েছে সে সম্পর্কে সঠিক কোনরূপ তথ্য নেই। স্থানীয় অধিবাসীদের অধিকাংশই বিশ্বাস করেন যে ঘাটশিলা থানার পার্শ্বে অবস্থিত মন্দিরে রঙ্কিণী দেবীর এই মূর্তিটিই সম্ভবত ধবল রাজারা পুরুলিয়া থেকে নিয়ে এসেছিলেন। মূর্তিটি সম্ভবত প্রথমে গালুডির মহুলিয়াতে অবস্থিত রঙ্কিণী মন্দিরের রাখা হয়েছিল ও পরে তা ঘাটশিলার মন্দিরে স্থানান্তরিত হয়। প্রচলিত লোককথা অনুসারে গালুডির মহুলিয়ায় রঙ্কিণী দেবীর বর্তমান মন্দিরটি প্রায় তিনশো বছরের অধিক সময় ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। পরবর্তীকালে ঝাড়গ্রামের শিলদা নিবাসী বিনয় দাস এই মন্দিরের সংস্কার ও পুনরুদ্ধার করেছিলেন।

মহুলিয়ার রঙ্কিণী মন্দিরের বিষয়ে প্রচলিত লোককথা অনুযায়ী-

> "প্রাচীনকালে পুরুলিয়ার পাড়া গ্রামে দেবী রঙ্কিণীর আবির্ভাব হয়েছিল। তখন পাড়া গ্রামের সন্নিকটে অবস্থিত একটি পাহাড়ে জঙ্গলের মধ্যে দেবী রঙ্কিণী বনদুর্গা রূপে বিরাজমান ছিলেন। প্রথম থেকেই রঙ্কিণী দেবী নরমাংসভোজী ছিলেন। দেবীর ক্ষুধা নিবারণের জন্য গ্রাম থেকে নিয়মিত প্রচুর খাবার ও একজন মানুষ পাঠানো হত। একদিন গ্রামের এক নিঃসন্তান ব্রাহ্মণ দম্পতির গোয়ালা বা বাগালকে রঙ্কিণী দেবীর নিকট প্রেরণের পালা আসে। ব্রাহ্মণ তাঁর পুত্রসম বাগালকে হারানোর চিন্তায় শোকে জর্জরিত হয়ে পড়েছিলেন। এমতাবস্থায় বাগাল রঙ্কিণী দেবীর রক্তপিপাসু স্বভাবকে চিরতরে উৎপাটিত করার উদ্দেশ্যে এক বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। সেইমতো বাগাল কিছু পরিমাণ লোহার ছোলা প্রস্তুত করে দেবীর কাছে উপস্থিত হয়েছিল। এরপর বাগাল দেবীকে প্রস্তাব দেয় যে দেবী ও তাঁর মধ্যে ছোলা খাওয়ার একটি প্রতিযোগিতা হবে। প্রতিযোগিতায় যে পরাজিত হবে তাঁকে বলি দেওয়া হবে। বাগালের প্রস্তাবে দেবী রঙ্কিণী তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে যান। তবে বাগালের দেওয়া লোহার ছোলা দেবী কোনভাবেই দাঁতে কাটতে সমর্থ হননি। অন্যদিকে বাগাল সুকৌশলে আসল ছোলা খেয়ে প্রতিযোগিতায় সহজেই জয়লাভ করেছিল। এরপর বাগাল একটি বটি নিয়ে দেবী রঙ্কিণীকে বলি দিতে উদ্যত হলে দেবী পালাতে আরম্ভ করেন। বাগালের তাড়ায় দেবী প্রথমে ধলভূমগড় ও তারপর যাদুগোড়ার কাপড়গাদী ঘাটে আশ্রয় নেন। কাপড়গাদী ঘাটে টুইলা পাহাড়ের নীচে একটি ঝর্ণা ছিল যা আজও বিদ্যমান। দেবী যখন টুইলা পাহাড়ে উপনীত হন তখন সেখানে এক ধোপা জামাকাপড় কাঁচার কাজে মগ্ন ছিলেন। বাগালেয় ভয়ে দেবী জড়ো করে রাখা কাপড়ের স্তূপের পেছনে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। ধোপার কাপড়ের স্তূপের আড়ালে থাকায় দেবী শেষপর্যন্ত বাগালের হাত থেকে নিস্তার পান। ধোপার প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত দেবী তাঁকে ধলভূমগড়ের রাজত্ব প্রদান করেন। অন্যদিকে ধোপার কাপড়ের স্তূপ দেবীর আশীর্বাদে পাষাণগাদীতে পরিণত হয়ে যায়।"[৬]

পরবর্তীকালে যাদুগোড়ার এই স্থানটি কাপড়গাদী ঘাট নামে পরিচিতি অর্জন করে। কথিত আছে যে ধলভূমগড় রাজবংশের প্রথম শাসক রাজচন্দ্র ধবলদেব পূর্বজীবনে একজন ধোপা ছিলেন। দেবীর আশীর্বাদে পরবর্তীকালে তিনি ধলভূমগড় রাজ্যের শাসক রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যাদুগোড়ার কাপড়গাদী ঘাট থেকে দেবী ধোপার সাথে গালুডির ঠাকুরান ডুংরীতে উপস্থিত হন ও সেখানে তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করেন। এরপর দেবী মহুলিয়ায় উপস্থিত হন। ধবল রাজাদের উদ্যোগে মহুলিয়ায় রঙ্কিণী দেবীর উদ্দেশ্যে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে মহুলিয়ার মন্দিরটি ঘাটশিলায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। সুতরাং যাদুগোড়া, মহুলিয়া, বড়বিল ও ঘাটশিলা এই চারটি জায়গায় অবস্থিত রঙ্কিণী মন্দিরগুলির মধ্যে এক আন্তঃসংযোগ রয়েছে। যদিও জনপ্রিয়তার নিরিখে যাদুগোড়ার কাপড়গাদী ঘাটের রঙ্কিণী মন্দির সবচেয়ে জনপ্রিয়।

যাদুগোড়ার রঙ্কিণী দেবীর কাহিনীতে পুরুলিয়ার পাঞ্চেত অথবা পাড়া থেকে এক ব্রাহ্মণের অনুপ্রেরণায় দেবীমূর্তি চুরি করে নিয়ে আসার কথা উল্লেখিত হয়েছে। ধলভূমগড়ের ধবল রাজবংশ যারা একদা রঙ্কিণী মূর্তি চুরি করেছিলেন, তাঁরা বংশকৌলীন্যের নিরিখে আদৌ ক্ষত্রিয় বর্ণভূক্ত ছিলেন না। বরং এই রাজবংশের উৎস নিহিত রয়েছে ভূমিজ আদিবাসীদের মধ্যে। ডাল্টনের অনুমান রঙ্কিণী দেবীর কাহিনীতে যে ধোপার উল্লেখ রয়েছে যিনি পরবর্তীকালে ধবল রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনি আদতে মানভূম তথা পুরুলিয়ার ভূমিজ জনগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত।[৭] দক্ষিণ পশ্চিম বাংলা সহ সমগ্র ছোটনাগপুরে ভূমিজদের বৃহৎ অংশের ওপর হিন্দু ধর্মের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। রিসলের গ্রন্থেও ভূমিজদের মধ্যে হিন্দু ধর্মের গ্রহণযোগ্যতার পক্ষে বক্তব্য রয়েছে। এমনকি হিন্দু ধর্ম গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষত্রিয় রাজবংশ হিসেবে ভূমিজ রাজাদের শাসনকার্য পরিচালনার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। পুরুলিয়ার বেগুনকোদরের রাজাদের বংশাবলীতে স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে ভূমিজ জাতিভূক্ত সামন্ততান্ত্রিক গোষ্ঠী থেকে তাঁরা নিজেদের ক্ষত্রিয়ত্বে উন্নীত করেছিলেন।[৮] বেগুনকোদরের রাজবংশ বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি বিশেষভাবে আস্থাশীল ছিল। রঙ্কিণী আদতে উচ্চকোটির কোনও হিন্দু দেবী নন বরং আদিতে তিনি ছিলেন আদিবাসী এক দেবীসত্তা। ভূমিজ জাতিভূক্ত ধবল রাজারা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করা সত্ত্বেও নিজেদের প্রাচীন উপাস্য দেবীকে কখনই পরিত্যাগ করেননি। তাই দেবী রঙ্কিণী ধবল রাজবংশের কূলদেবীর মর্যাদা অর্জন করেছিলেন। সুতরাং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রঙ্কিণী দেবীর খড়্গ' শীর্ষক গল্পে রঙ্কিণীকে যে বুনো অসভ্য জাতির দেবী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে তাতে বিন্দুমাত্র ভুল নেই। কারণ রঙ্কিণী আদ্যপান্ত এক আদিবাসী দেবী। ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণবাদের মেকি অহংবোধের দরুন রঙ্কিণী দেবীর উপাসকগোষ্ঠীকে বুনো ও অসভ্য হিসেবে বিশেষায়িত করা হয়েছে। সর্বোপরি রঙ্কিণীর ন্যায় এক আদিবাসী দেবী সত্তাকে হিন্দু ধর্মে জায়গা করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর মূর্তিরূপের অবতারণা করা হয়েছে। আসলে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু ধর্মে দেব-দেবীর মূর্তি ব্যতীত নিরাকার তথা অপরিশীলিত রূপের তেমন গ্রহণযোগ্যতা নেই। তাছাড়া কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে যে রঙ্কিণী দেবীর মূর্তি পাঞ্চেত থেকে এক ব্রাহ্মণের প্ররোচনায় ধবল রাজারা চুরি করেছিলেন। কাহিনীতে এক ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গ উপস্থাপনের মাধ্যমে কার্যত শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়ায় আদিবাসী দেবী রঙ্কিণীকে হিন্দু ধর্মের পরিমণ্ডলে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার প্রবণতা প্রতিফলিত হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে আদিবাসী দেব-দেবীর প্রকৃতি পরিবর্তনের মাধ্যমে তাঁকে ব্রাহ্মণ্যবাদী দেবসত্তা হিসেবে উপস্থাপনের অসংখ্য নজীর রয়েছে। অসমের খাসি জনগোষ্ঠীর দেবী এভাবেই জনপ্রিয় হিন্দু দেবী কামাখ্যায় রূপান্তরিত হয়েছেন। রঙ্কিণীর কাহিনিতে দেবীর আদিবাসী সত্তা মুছে ফেলার জন্যই একজন ব্রাহ্মণের উপস্থিতি আবশ্যক ছিল। এই একই কারণেই আবার রঙ্কিণী দেবীর মূর্তিরূপের কল্পনা করা হয়েছিল। গালুডির মহুলিয়াতে অবস্থিত মন্দিরে প্রথমে দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ও পরে তা ঘাটশিলার থানার পার্শ্বে অবস্থিত মন্দিরে স্থানান্তরিত হয়েছিল। জঙ্গলমহল সহ ছোটনাগপুর অঞ্চলে বৈষ্ণব মতাদর্শের বিশেষ প্রভাব রয়েছে। এই অঞ্চলের বৈষ্ণব ভাবধারার সাথে সম্পৃক্ত কাহিনীতেও রঙ্কিণী দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। চৈতন্যত্তোর সময়কালে প্রভু শ্যামানন্দের নেতৃত্বে মেদিনীপুর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে বৈষ্ণব ভাবাদর্শ সম্প্রসারণের মহান কার্যকলাপ সম্পন্ন হয়েছিল। কলাইকুণ্ডার নিকটস্থ ধারেন্দা গ্রামে শ্যামানন্দ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মেদিনীপুরের অন্তর্গত গোপীবল্লভপুরের রোহিণী রাজবংশের শাসক রসিকানন্দ ছিলেন প্রভু শ্যামানন্দের অন্যতম এক শিষ্য। শ্যামানন্দের অনুপ্রেরণায় রসিকানন্দ স্বীয় রাজ্যে বৈষ্ণব ভাবধারার প্রচারকার্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। শ্যামানন্দের একটি জীবনীমূলক গ্রন্থে রঙ্কিণী দেবীর উল্লেখ আছে। সংশ্লিষ্ট গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে-

> "একদা শ্যামানন্দ তাঁর শিষ্য রসিকানন্দের সাথে ধলভূমগড় রাজ্যে গমন করেছিলেন। সেখানকার রাজা রাজপ্রাসাদে তাঁদের থাকার সুবন্দোবস্ত করে দেন। একদিন গভীর রাত্রে নরমাংস ভক্ষণের উদ্দেশ্যে দেবী রঙ্কিণী রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হন। যদিও তৎক্ষণাৎ রঙ্কিণী দেবী শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দকে চিনতে পারেন। দেবী তখন তাঁদের পাদপদ্মে ভূমিষ্ঠ হয়ে বারবার প্রণাম করতে শুরু করেন। এরপর দেবী রঙ্কিণী রাজা নবীন কিশোর ধলের সামনে আবির্ভূত হয়ে শ্যামানন্দ প্রভুর চরণে আশ্রয়গ্রহণের নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশ পালিত না হলে তিনি রাজার পুরো পরিবারকে হত্যা করার হুঁশিয়ারি প্রদান করেছিলেন।"[৯]

যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে শ্যামানন্দ রাজা নবীন কিশোরকে দীক্ষাদানে রাজী হননি। এমতাবস্থায় রঙ্কিণী দেবী স্বয়ং শ্যামানন্দের নিকটে উপস্থিত হয়ে দীক্ষাদানের জন্য কাতর অনুরোধ করেন ও শেষপর্যন্ত ধবল রাজ বৈষ্ণব আদর্শে দীক্ষিত হন। এরপর রঙ্কিণী দেবী আজীবনের জন্য ধলভূমগড় পরিত্যাগ করে শ্যমান্দের সাথে গোপীবল্লবপুরে এসে হাজির হন ও সেখানে দেবীর উদ্দেশ্যে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দেওয়া হয়। এই কাহিনীটি নিতান্তই কাল্পনিক। আসলে রঙ্কিণী দেবীর মাহাত্ম্য দক্ষিণ পশ্চিম বাংলায় এতখানি জনপ্রিয় ছিল যে তা উপেক্ষা করা সম্ভবপর নয়। বৈষ্ণব সাধকের পদতলে রঙ্কিণী দেবীর

আশ্রয় গ্রহণের এরূপ কাহিনীর মাধ্যমে কার্যত বৈষ্ণব মতাদর্শের উৎকর্ষ প্রতীয়মান হয়। রঙ্কিণীর ন্যায় এক শক্তিশালী উগ্র দেবীকে বৈষ্ণব ধর্ম যে কত সহজেই বশীভূত করতে সক্ষম হয়েছে তা এই কাহিনীর অন্যতম উপজীব্য বিষয়। এভাবে সাধক শ্যামানন্দের জীবন বৃত্তান্তে রঙ্কিণী দেবীর চিত্রায়নে বৈষ্ণব ভাবধারার চূড়ান্ত অহমিকার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। রঙ্কিণী একজন দেবী হয়েও বৈষ্ণব সাধকের প্রতি শেষপর্যন্ত আত্মসমর্পণে কতখানি উদগ্রীব ছিলেন তার মাধ্যমে আদিবাসী ধর্মজীবনের বিরুদ্ধে বৈষ্ণব ভাবধারার বিজয় ঘোষিত হয়েছে। তবে শত প্রচেষ্টার পরও রঙ্কিণী দেবীর ক্ষেত্রে তাঁর আদিবাসী পরিচয় কিন্তু চিরতরে বিলীন হয়ে যায়নি বরং এই দেবীর প্রাচীন পরিচয় তথা উৎস আজও প্রকট রূপে প্রতীয়মান।

যাদুগোড়ায় অবস্থিত রঙ্কিণী দেবীর মন্দিরটি আজও দেবীর প্রাচীন সত্তার এক অনন্য পরিচয় বহন করে চলেছে। মহুলিয়া ও বড়বিল এবং ঘাটশিলার মন্দিরের রঙ্কিণী দেবী হিন্দু ধর্মের প্রভাবে স্বীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ হারিয়ে ফেললেও যাদুগোড়ায় তা হয়নি। ১৯৬৪ সাল নাগাদ যাদুগোড়ায় টুইলা পাহাড়ের সন্নিকটে দ্রাবিড় শৈলীর আদলে নির্মিত মন্দিরে রঙ্কিণী দেবীর কোনরূপ মূর্তি নেই। এক বিশালাকার অপরিশীলিত প্রস্তরখণ্ড রূপে রঙ্কিণী দেবী যাদুগোড়ার মন্দিরে বিরাজমান। সর্বোপরি এই মন্দিরে কোনরূপ হিন্দু ব্রাহ্মণ পূজারী নেই। একমাত্র ভূমিজ জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কেউ পৌরহিত্যের অধিকার পান। বর্তমানে যাদুগোড়ার রঙ্কিণী মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করছেন অনিল সিং এবং তিনি জাতিতে একজন ভূমিজ। মন্দিরের সহকারী পূজারী পদে রয়েছেন ভূমিজ গোষ্ঠীভূক্ত সন্তোষ সিং। ভূমিজদের কাছে রঙ্কিণী দেবী অত্যন্ত জাগ্রত হিসেবে মর্যাদা অর্জন করেছেন। তবে রঙ্কিণী শুধুমাত্র ভূমিজদের দেবী নন, বরং ছোটনাগপুরের সমস্ত আদিবাসী সম্প্রদায়ের কাছে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় এক সত্তা। ছোটনাগপুর অঞ্চলের বৃহত্তম আদিবাসী সম্প্রদায় সাঁওতালদের মধ্যেও রঙ্কিণী দেবীর যথেষ্ট সমাদর রয়েছে। বিজয়া দশমীর পরেরদিন ঝাড়গ্রাম জেলার শিলদার ওড়গোন্দাতে ভৈরব থানে সাঁওতালদের পাটাবিন্ধা মেলা বা পরব উদযাপিত হয়। ওড়গোন্দার ভৈরব দেবতা সাঁওতালদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়। তাঁরা আজও বিশ্বাস করেন যে পাটাবিন্ধা পরবের শেষদিনে যাদুগোড়ার রঙ্কিণী দেবী পাতালপথের মাধ্যমে শিলদায় ভৈরব দেবতার সাথে মিলিত হতে আসেন। এসময় নাকি প্রচণ্ড শব্দে সমগ্র এলাকা কেঁপে ওঠে। তখন ভৈরবকে শান্ত করার জন্য শাঁখ বাজানো হয় ও জল ঢালা হয়। বিনয় ঘোষ শিলদার ভৈরব থানের বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন-

> "ভৈরব যেখানে আছেন, সেখানে ভৈরবীও থাকবেন। শিলদার প্রতাপশালী ভৈরবের ভৈরবী কোথায়? শিলদায় নয়। ভৈরব থাকেন শিলদায়, আর ভৈরবী থাকেন ধলভূমগড়ে। ভৈরবীর নাম রঙ্কিণী।"[১০]

তবে ধলভূমগড় বা ঘাটশিলায় সর্বমোট চারটি রঙ্কিণী দেবীর মন্দির রয়েছে। যদিও সাঁওতালরা বিশ্বাস করেন যে একমাত্র যাদুগোড়ার রঙ্কিণী মন্দিরের সাথেই শিলদার ভৈরব থানের পাতালপথে যোগাযোগ রয়েছে ও প্রতিবছর এই পথ ধরেই রঙ্কিণী দেবী ভৈরবের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক ভৈরব থান রয়েছে। এগুলির অধিকাংশই হল আদতে আদিবাসী দেবতা মারং বুরুর উপাসনাস্থল। মারং বুরু হলেন পাহাড়ের দেবতা। যদিও বর্তমানে মারাং বুরু ভৈরব আর শিবের সাথে কার্যত একাত্ম হয়ে গেছেন। শিলদার ভৈরব থানটিও হল আসলে মারাং বুরুর পূজাস্থল। সুতরাং মারাং বুরুর সাথে রঙ্কিণী দেবীর এহেন সংযোগ তাঁর প্রাচীন উপজাতীয় সত্তার অন্যতম এক পরিচায়ক। প্রাচীন ধলভূমগড়ে কেন এতখানি সন্নিকটে পরপর চারটি রঙ্কিণী মন্দির গড়ে উঠেছিল তা বলা সম্ভবপর নয়। তবে এগুলির মধ্যে একমাত্র যাদুগোড়ার রঙ্কিণী দেবীর মধ্যেই উপজাতীয় সত্তা অটুট রয়েছে। বাকি তিনটি মন্দিরে রঙ্কিণী দেবী বর্তমানে হিন্দু ব্রাহ্মণদের প্রভাবাধীন। শিলদার নিকটে অবস্থিত চিল্কিগড়ের জামবনীতে রঙ্কিণী দেবীর একটি মন্দির রয়েছে। যদিও চিল্কিগড়ের বিখ্যাত কনকদুর্গার আড়ালে তাঁর মাহাত্ম্য আজ চাপা পড়ে গেছে।

হিন্দু দেবীসত্তায় পরিবর্তিত হলেও রঙ্কিণীর আদিবাসী তথা উপজাতীয় অতীত হারিয়ে যায়নি। ঘাটশিলার রঙ্কিণী মন্দিরে আজও উৎসবের সময় কাঁড়া বা মহিষ বলি দেওয়া হয়। ঘাটশিলার এই মন্দিরটি ধবল রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়েছিল। ধবলদের উৎস যেহেতু নিহিত রয়েছে ভূমিজ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে ও রঙ্কিণী তাঁদের কূলদেবী সেহেতু ঘাটশিলার মন্দিরে বলি প্রথা প্রচলিত রয়েছে। যদিও এই মন্দিরের বর্তমান পূজারী একজন বাঙালী ব্রাহ্মণ। অন্যদিকে মহুলিয়া ও বড়বিলের মন্দিরে এখন আর বলি হয় না। তবে যাদুগোড়ার রঙ্কিণী দেবী বাকি সমস্ত রঙ্কিণী মন্দিরের থেকে একেবারেই আলাদা। দক্ষিণ পশ্চিম বাংলা ও ছোটনাগপুর মালভূমির আদিবাসীদের মধ্যে একমাত্র যাদুগোড়ার রঙ্কিণী দেবীরই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। কালীপূজার সময় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আদিবাসীরা শুধুমাত্র যাদুগোড়ার রঙ্কিণী দেবীর দর্শনেই যান। যদিও বছরের অন্যান্য সময় নিয়মিতভাবে তাঁরা যাদুগোড়ার রঙ্কিণী মন্দির দর্শনে আসেন। সমস্ত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কাছেই যাদুগোড়ার রঙ্কিণী দেবীর থান তথা মন্দির পবিত্র রূপে বিবেচিত হয়। তাঁরা দেবীর কাছে মানত করেন

ও মন্দির চত্বরে দেবীর উদ্দেশ্যে পাঁঠা, পায়রা ও মোরগ বলি দেন। প্রায় প্রতিদিনই রঙ্কিণী দেবীর এই মন্দিরে বলি অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দু সমাজের তরফে মহুলিয়া ও ঘাটশিলায় অবস্থিত রঙ্কিণী দেবীর মন্দিরদ্বয়কে ধলভূমগড়ে রঙ্কিণী দেবীর আদি পীঠস্থান হিসেবে প্রচার করা হলেও জনপ্রিয়তার নিরিখে যাদুগোড়ার রঙ্কিণী দেবীর মন্দিরের সমকক্ষ কোনটিই হয়ে উঠতে পারেনি। আসলে যাদুগোড়ার দেবী রঙ্কিণী আদিবাসী ভূমিজ জনগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে থাকার বিষয়টি হিন্দু সমাজের তেমন মনঃপূত হয়নি। সেকারণেই সম্ভবত যাদুগোড়ার রঙ্কিণী দেবীর বিকল্প হিসেবে মহুলিয়া, বড়বিল ও ঘাটশিলায় রঙ্কিণী দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই তিন মন্দিরে দেবী রঙ্কিণী কালীর এক অন্যতম রূপ হিসেবে পূজিত হন। সর্বোপরি যাদুগোড়ার দেবী রঙ্কিণীই সম্ভবত সবচেয়ে প্রাচীন। কারণ রঙ্কিণী দেবী সম্বন্ধে প্রচলিত সমস্ত কাহিনীতে যাদুগোড়ার রঙ্কিণী দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এমনকি যাদুগোড়ার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবস্থিত বাকি তিনটি রঙ্কিণী মন্দিরের কাহিনীর সাথেও যাদুগোড়ার রঙ্কিণী সম্পৃক্ত রয়েছেন। রঙ্কিণীদেবীকে ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও যাদুগোড়ার রঙ্কিণী দেবীর মাহাত্ম্য এড়িয়ে যাওয়া সম্ভবপর হয়নি। আসলে যাদুগোড়ার রঙ্কিণী দেবীর মাহাত্ম্য স্বীকৃত না হলে অন্যান্য স্থানের রঙ্কিণী দেবীকে বৈধতা প্রদান করা সম্ভবপর হত না। এমনকি যাদুগোড়ায় রঙ্কিণী দেবীর থানে হিন্দু শৈলীতে মন্দির নির্মিত হলেও দেবীর আদিবাসী অতীতকে বিনষ্ট করে দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে ব্রাহ্মণ্যবাদ দেবী রঙ্কিণীকে গ্রাস করার প্রচেষ্টা যে সর্বতোভাবে করেছিল তার স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। শ্যামানন্দের কাহিনীতে দেবীকে বৈষ্ণব সাধকের কাছে করুণা ভিক্ষা করতে দেখা গেছে। সুকৌশলে দেবী রঙ্কিণীর নামে নেতিবাচক ধারণা প্রচার করা হয়েছে। রঙ্কিণী দেবীকে রক্তখেকো দেবী হিসেবে চিত্রায়নের নিন্দনীয় প্রচেষ্টাও হয়েছে। ভারতবর্ষে যদিও নরবলির ধারণা বহু প্রাচীন। তবে পূর্ব ভারতের ওড়িশার খোন্দ আদিবাসী ব্যতীত অপর কোনও জনগোষ্ঠীর মধ্যে নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল না। সুতরাং রঙ্কিণী দেবীর সাথে নরবলি প্রথার সম্পৃক্তকরণ যে এক ব্রাহ্মণ্যবাদী অপপ্রচার তা আর বুঝতে অসুবিধা হয় না। তাই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রঙ্কিণী দেবীর খড়্গ' শীর্ষক গল্পের সমাপ্তিতে উল্লেখিত হয়েছে-

> "তিনি অমঙ্গলের পূর্বাভাস দিয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দেন মাত্র। মূর্খ জনসাধারণ তাঁহাকেই অমঙ্গলের কারণ ভাবিয়া ভুল বোঝে।"[১১]

আসলে প্রবল প্রতাপশালী ব্রাহ্মণ্যবাদ সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও রঙ্কিণী দেবীর উৎপত্তির ইতিহাস মুছে ফেলতে সক্ষম হয়নি। এমনকি ধলভূমগড়ের ধবল রাজবংশ তাঁদের পূর্বেকার আদিবাসী পরিচয় পরিত্যাগ করে হিন্দু ক্ষত্রিয়ের পর্যায়ভুক্ত হলেও রঙ্কিণী দেবীকে তাঁরা কখনই পরিত্যাগ করেননি। তাই রঙ্কিণী ধবল রাজাদের কূলদেবী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। যদিও দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে আদিবাসী দেবীসত্তা থেকে বিবর্তিত হয়ে বর্তমানে হিন্দু দেবী কালীর অন্যতম রূপ হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত রঙ্কিণী দেবী একমাত্র যাদুগোড়া ব্যতীত সর্বক্ষেত্রে আজ পুরোদস্তুর এক হিন্দু দেবীতে রূপান্তরিত হয়েছেন।

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *রঙ্কিণী দেবীর খড়্গ*, গজেন্দ্রকুমার মিত্র (সম্পা.), বিভূতি রচনাবলী, নবম খণ্ড, চতুর্থ মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৌষ ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২২৪।

২। তদেব, পৃ. ২২৪।

৩। ডাল্টন, এডওয়ার্ড টুইট, *ডেসক্রিপটিভ এথনোলজি অফ বেঙ্গল*, প্রথম মুদ্রণ, অফিস অফ দ্য সুপারিন্টেনডেন্ট অফ গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং, কলকাতা, ১৮৭২, পৃ. ১৭৪।

৪। দে, সুনীল কুমার, *কাপড়গাদী ঘাটের মা রঙ্কিণী*, প্রথম মুদ্রণ, ঝাড়খণ্ড সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ, পূর্ব সিংভূম, ২০২২, পৃ. ৩৮।

৫। ডাল্টন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬।

৬। দে, সুনীল কুমার, প্রাগুক্ত, ১০২-১০৩।

৭। ডাল্টন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬।

৮। মাহাতো ,পশুপতি প্রসাদ, *জঙ্গলমহল ও ঝাড়খণ্ডী লোকদর্শন*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পূর্বালোক পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৫১-৫২।

৯। নন্দ ও দেব শ্রী কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী প্রভূপাদ, *প্রভূ শ্রী শ্রী শ্যামানন্দ*, প্রথম মুদ্রণ, প্রভূ শ্যামানন্দ প্রেম সংস্থান, বৃন্দাবন, ২০০৪, পৃ. ৪১-৪৪।

১০। ঘোষ, বিনয়, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি*, প্রথম মুদ্রণ, পুস্তক প্রকাশক, কলকাতা, ১৯৫০, পৃ. ৩৬১।

১১। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭।